নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ২৩-০৩-২০২৩ (পৃঃ ০৫)

ড. জাহাঙ্গীর আলম

গণভবনের খামার ও জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার

দেশে এ পর্যন্ত ১ হাজার ২শ' কিলোমিটার জমি নদী ভাঙনের কবলে হারিয়ে গেছে। লবণাক্ততার কারণে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ১০ লাখ ৬৫ হাজার হেক্টর জমির চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। জলাবদ্ধতা থাকায় ১২ লাখ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। খরার কারণে উৎপাদন কমে যাচ্ছে ৪৩ শতাংশ জমির। তাতে করে মার খাচ্ছে প্রায় এক- তৃতীয়াংশ ফসলের উৎপাদন। নদীর নাব্য বৃদ্ধি করে ভাঙন রোধ, লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু শস্যের বীজ সম্প্রসারণ এবং চাষাবাদের ধরন পাল্টিয়ে এই ক্ষতি থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধানের জাত লবণাক্ততার মাঝেও ভালো উৎপাদনে সহায়ক বলে প্রমাণিত। খরা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্যও গবেষণা হচ্ছে। এ কাজে আরও সহায়তা প্রয়োজন। দেশের প্রতিইঞ্চি জমি চাষের আওতায় এনে কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহার ও জমির উর্বরতা হ্রাস রোধকল্পে এখন সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। এ বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি

কৃষিজমি হ্রাস পাচ্ছে। অপরদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে জমির ওপর মানুষের ঘনত্ব বাড়ছে। নিবিড় চাষাবাদের কারণে জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। কৃষিজমি হ্রাসের কারণে কমে যাচ্ছে ফসলের উৎপাদন। আর জমির উর্বরা শক্তি হ্রাসের কারণে হুমকির মুখে পড়ছে বিভিন্ন শস্যের চাষাবাদ। আমাদের জাতীয় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও স্থায়িত্বশীল খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটা মারাত্মক বাধার সৃষ্টি করেছে। আগামী প্রজন্মকে দেশের সীমিত জমির ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হলে এই প্রবণতাকে ঠেকাতে হবে। কৃষি জমির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। আবাদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে সকল পতিত জমি। কৃষির বহুধাকরণ নিশ্চিত করে প্রতিটি কৃষককে স্বয়ম্ভর হতে হবে কৃষিপণ্যের উৎপাদনে।

স্বাধীনতার পর দেশে ছিল চরম খাদ্য সংকট। এই সংকট থেকে উত্তরণের জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশকে খাদ্যে স্বয়ম্ভর করতে চেয়েছিলেন। কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উদার সহায়তা দিয়েছিলেন। কৃষিকে তিনি বহুমুখী করার কথা বলেছিলেন। এক ইঞ্চি জমিও যাতে পতিত না থাকে তার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি দেশের খাদ্যশস্যের উৎপাদন দ্বিগুণ/তিনগুণ বৃদ্ধির অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছিলেন। সেই সফলতা তিনি পুরোপুরি দেখে যেতে পারেননি। তার আগেই তিনি দেশদ্রোহী একদল সৈনিকের বুলেটের আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। তার পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়েছে। দেশের কৃষির উৎপাদন দ্বিগুণ, তিনগুণ, ক্ষেত্রবিশেষে চারগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁরই সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার দ্বারপ্রান্তে। তবুও দেশে খাদ্য ঘাটতি আছে। আবহাওয়া বিরূপ থাকলে ঘাটতির মাত্রা বেড়ে যায়। আমাদের নির্ভর করতে হয় অতিমাত্রায় আমদানির ওপর। সম্প্রতি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে খাদ্যশস্যের দাম। কয়েক বছর ধরে করোনা মহামারির কারণে বিশ্বব্যাপী খাদ্যশস্যের উৎপাদন বিঘ্নিত হয়েছে। গত বছর থেকে রাশিয়া- ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্য সরবরাহ হ্রাস পেয়েছে। অনেক বেড়েছে খাদ্যশস্যের আন্তর্জাতিক মূল্য। সামনে এক বিশাল খাদ্য ঘাটতি ও দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা করছে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। এমন পরিস্থিতিতে দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি খাদ্য উৎপাদনে আবাদি জমি সংরক্ষণ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তা ছাড়া প্রতিইঞ্চি পতিত জমি চাষের আওতায় নিয়ে আসার পরামর্শ দিয়েছেন। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪ লাখ ৩১ হাজার হেক্টর আবাদযোগ্য পতিত জমি রয়েছে। এটি আমাদের মোট আবাদযোগ্য জমির প্রায় পাঁচ শতাংশ। এর মধ্যে আছে চিনিকল, পাটকল, বস্তি পর্যায়ের মিল-কারখানা, সেনাবাহিনী, পুলিশ ও রেলের অধীনস্থ বিশাল আকারের পতিত জমি। তা ছাড়া স্কুল-কলেজ ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের আওতায় রয়েছে অনেক পতিত জমি। তদুপরি জেলা, উপজেলা পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের বাসা-বাড়ির চারপাশেও রয়েছে প্রচুর অনাবাদি জমি। সিলেট, বরিশাল, বৃহত্তর চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকা এবং উপকূলীয় লবণাক্ত অঞ্চলেও অনেক জমি অনাবাদি রয়ে গেছে। এগুলো আবাদের আওতায় আনা দরকার। তা ছাড়া আমাদের বসতবাড়ির চারপাশে যেসব জমি অনাবাদি পড়ে আছে তারও সর্বোচ্চ ব্যবহার প্রয়োজন। সেদিক থেকে এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর সরকারি বাসভবন গণভবনের বিশাল আঙ্গিনায় হাঁস-মুরগি, কবুতর, গরু পালনের পাশাপাশি শাক-সবজি, ফুল-ফল, মধু ও মাছ চাষ করেছেন। তিল, সরিষা ও পেঁয়াজের চাষ করেছেন। বাঁশফুল, পোলাওয়ের চাল, লাল চালসহ পালং শাক, ধনেপাতা, বতুয়া শাক, ব্রোকলি, টমেটো, লাউ, শিমসহ সব ধরনের শীতকালীন সবজির চাষ করেছেন। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের মসলা, আম, কাঁঠাল, কলা, লিচু, বরই, ড্রাগন, স্ট্রবেরিসহ বিভিন্ন ধরনের ফল ফলিয়েছেন। তদুপরি গোলাপ, সূর্যমুখী, গাঁদা, কৃষ্ণচূড়াসহ বিভিন্ন ধরনের ফুলেরও চাষ করেছেন। এভাবে তিনি গণভবনের আঙ্গিনার পতিত প্রতিইঞ্চি জমিকে উৎপাদনের আওতায় এনেছেন। দেশের জনগণের প্রতি নিজের আহ্বানকে বাস্তবে রূপদান করে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তাতে কৃষির উৎপাদনে আগ্রহী ও অনুপ্রাণিত হবে সাধারণ মানুষ। এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ছোটবেলায় বাবার কাছেই কৃষির হাতেখড়ি। তিনিই আমাদের ভাই-বোনকে কৃষি অনুশীলনের সুযোগ করে দিতেন। পরবর্তীতে দেশের রাজনীতির সঙ্গে যখন সরাসরি সম্পৃক্ত হলাম, তখনো গ্রামের হতদরিদ্র মানুষ নিয়ে কাজ করেছি। দেখেছি তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা। আমাদের দেশের অর্থনীতির ভিতই তো কৃষির ওপর। অন্যদিকে জনসংখ্যাও বেশি। সেটা বিচার করে কৃষির ওপর জোর দিতেই হয় সব সময়।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের জমি এত উর্বর, একটু চেষ্টা করলেই আমরা আমাদের উৎপাদন আরও বাড়াতে পারি।'

কৃষি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর উপলব্ধি আমাদের জাতীয় উপলব্ধিরই নামান্তর। তিনি নিজে তাঁর সরকারি বাসভবনের ভেতরের জায়গাটাকে কৃষি খামারে রূপান্তরিত করেছেন। এর আগে তাঁরই উদ্যোগে জাতীয়ভাবে গড়ে উঠেছে, 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্প। এখন তিনি গণভবনের বিশাল চত্বরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একটি বড় ধরনের কৃষি খামার। আমাদের জন্য এটি বড় শিক্ষণীয় বিষয়। দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় ও জেলা শহরে অনেক সরকারি বাসভবনে প্রচুর জমি খালি পড়ে আছে। এগুলো সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উদ্যোগে আবাদের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। তাতে দেশের জনগণের কাছে এগুলো প্রদর্শনী খামার হিসেবে বিবেচিত হবে। তা ছাড়া পুলিশ, সেনাবাহিনী, আনসার ও অন্যান্য সরকারি স্থাপনার আওতাধীন পতিত জমিগুলোতেও বহুমুখী কৃষি খামার স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া একান্ত প্রয়োজন।

আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এর হার হ্রাস করতে হবে। কৃষি জমির অকৃষি খাতে ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আমাদের দেশে বিভিন্ন শিল্প, শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং অনেক উন্নয়ন কর্মকান্ডের জন্য জমি অধিগ্রহণ করা হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধানতার অভাবহেতু প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি জমি অধিগ্রহণ করা হয়। তাতে বিপুল পরিমাণ জমি চাষের আওতাবহির্ভূত হয়ে যায়। কিন্তু সেই অধিগ্রহণকৃত জমি সর্বোত্তমভাবে ব্যবহার করা যায় না। আমাদের দেশে অনেক শিল্পনগরী আছে যেখানে অধিগৃহীত জমির ব্যবহার অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক। এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়, বিভিন্ন কাজে আমাদের অধিগৃহীত জমির শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ অব্যবহৃত পড়ে আছে। এটা নিতান্তই অপচয়। এই অপচয় রোধ করতে হবে। বিশেষ করে সেচ সুবিধাযুক্ত জমির অধিগ্রহণ পুরোপরি নিষিদ্ধ করতে হবে। যে জমিতে দুই বা ততোধিক ফসল ফলে, এমন জমি ব্যক্তিগত বা সরকারি নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা যাবে না। এ ধরনের অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে জমির পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে সীমিত রাখতে হবে। যেখানে সম্ভব সরকারি খাস জমি অধিগ্রহণ করতে হবে। অপরদিকে অধিগ্রহণকৃত অব্যবহৃত জমি কৃষি কাজে ব্যবহার করতে হবে। তা ছাড়া ইটভাঁটির ব্যবহার নিরুৎসাহিত করতে হবে। জমির খন্ড-বিখন্ডতা হ্রাস এবং উর্বরতা হারানো জমিগুলোর উর্বরতা বাড়ানোর জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বাংলাদেশে এমন অনেক রাস্তাঘাট আছে যেগুলোর একান্তই প্রয়োজন ছিল না। একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি তার নিজের সুবিধার জন্য বাড়ির আঙ্গিনা দিয়ে সরকারি অর্থে রাস্তা নির্মাণ করেছেন, এমন উদাহরণও একেবারে কম নেই। এগুলো নিরুৎসাহিত করতে হবে। তা ছাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, মহাসড়কের দুই ধার, স্কুল-কলেজের আঙ্গিনা, স্থানীয় জলাভূমি প্রভৃতির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এগুলোতে বিভিন্ন শস্যের চাষ, ফলদ বৃক্ষ রোপণ, পশু-পাখি পালন, মৎস্য চাষ ইত্যাদি উৎপাদনমূলক কর্মকান্ডের প্রসার ঘটিয়ে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনের পথ সুগম করতে হবে।

এক হিসাবে দেখা যায়, আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ জমি শস্য চাষের জন্য খুবই উপযোগী। ৪০ ভাগ জমি মধ্যম মাত্রার উপযোগী আর বাকি ২৫ ভাগ জমি শস্য উৎপাদনের জন্য কম উপযোগী। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য খাবার জোগাতে হলে ফসল চাষের জন্য ভালো উপযোগী জমি অবশ্যই সংরক্ষণ করতে হবে। অকৃষি কাজে ব্যবহারের জন্য ছাড় দিতে হবে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের জমি। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে চাষযোগ্য জমি অকারণে গ্রাম সম্প্রসারণের জন্য ব্যবহৃত না হয়। ছোটখাটো শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তুলতে হবে গ্রামীণ গ্রোথ সেন্টারগুলোকে কেন্দ্র করে। তা ছাড়া বিক্ষিপ্তভাবে বাড়িঘর তৈরি না করে সুপরিকল্পিতভাবে তা স্থাপন করতে হবে রাস্তার দু'পাশে নির্ধারিত এলাকায়। গ্রামীণ আবাসনের জন্য যেখানে সম্ভব, সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বহুতল দালান। এক্ষেত্রে ব্যক্তি পর্যায়ে সহজ কিস্তির ঋণ সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলাকাকে আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিক এবং কৃষি জোনে চিহ্নিত করে নিতে হবে। প্রণয়ন করতে হবে ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ। তেমনিভাবে শহর এলাকাগুলোকেও আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প এলাকা হিসেবে কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে হবে। মসজিদ-মন্দির, স্কুল-কলেজ ও খেলাধুলার স্থানগুলোকেও চিহ্নিত করতে হবে আলাদাভাবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে কোনো অবস্থাতেই কেউ ল্যান্ড জোনিংকে অমান্য করে নতুন স্থাপনা গড়তে না পারে।

আমাদের দেশের বনাঞ্চল ক্রমেই উজাড় হচ্ছে। গাছ কেটে মানুষ বিরানভূমিতে পরিণত করছে সংরক্ষিত বনভূমি। সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। বনায়নের উপযোগী ভূমিতে পরিকল্পিতভাবে বৃক্ষায়নের মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ প্রক্রিয়াকে ঠেকানো যেতে পারে। তা ছাড়া জুম চাষ ও স্থানান্তরিত চাষাবাদের মাধ্যমে পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমির যে ক্ষতিসাধন হচ্ছে, জুমিয়াদের পরিকল্পিত স্থায়ী আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার প্রতিকার করা যেতে পারে। ভূমি উদ্ধার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নতুন জেগে ওঠা চরে উপযুক্ত চাষাবাদের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।

এক সমীক্ষায় প্রকাশ, দেশে এ পর্যন্ত ১ হাজার ২শ' কিলোমিটার জমি নদী ভাঙনের কবলে হারিয়ে গেছে। লবণাক্ততার কারণে বরিশাল ও খুলনা বিভাগের ১০ লাখ ৬৫ হাজার হেক্টর জমির চাষাবাদ ব্যাহত হচ্ছে। জলাবদ্ধতা থাকায় ১২ লাখ হেক্টর জমিতে চাষাবাদ করা যাচ্ছে না। খরার কারণে উৎপাদন কমে যাচ্ছে ৪৩ শতাংশ জমির। তাতে করে মার খাচ্ছে প্রায় এক- তৃতীয়াংশ ফসলের উৎপাদন। নদীর নাব্য বৃদ্ধি করে ভাঙন রোধ, লবণাক্ততা ও খরা সহিষ্ণু শস্যের বীজ সম্প্রসারণ এবং চাষাবাদের ধরন পাল্টিয়ে এই ক্ষতি থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। ইতোমধ্যে উদ্ভাবিত বিভিন্ন ধানের জাত লবণাক্ততার মাঝেও ভালো উৎপাদনে সহায়ক বলে প্রমাণিত। খরা সহিষ্ণু বিভিন্ন ফসলের জাত উদ্ভাবনের জন্যও গবেষণা হচ্ছে। এ কাজে আরও সহায়তা প্রয়োজন। দেশের প্রতিইঞ্চি জমি চাষের আওতায় এনে কৃষি জমির অকৃষি কাজে ব্যবহার ও জমির উর্বরতা হ্রাস রোধকল্পে এখন সকলের সচেতনতা বৃদ্ধি করা দরকার। এ বিষয়ে নতুন নীতিমালা প্রণয়ন করা অত্যন্ত জরুরি।

লেখক : কৃষি অর্থনীতিবিদ ও বীর মুক্তিযোদ্ধা পরিচালক, ঢাকা স্কুল অব ইকোনমিকস এবং সাবেক উপাচার্য, ইউনিভার্সিটি অব গ্লোবাল ভিলেজ